রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত - ভাসানচর এবং শিক্ষা

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

কম বয়সে বিয়ে: এক জটিল কাহিনী, শুধু বয়সের ব্যাপার নয়...

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা পুরুষেরা মতামত দেওয়ায় এগিয়ে থাকলেও নারীরা ফলাফল নিয়ে বেশি সন্তুষ্ট

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১১ × বুধবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত - ভাসানচর এবং শিক্ষা

এই বিশ্লেষণটি ১৮ জন ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা, ৪০ জন সি.এস.আই স্বেচ্ছাসেবক এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের প্রতিদিন সংগ্রহ করা মতামতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এই মতামতগুলি ক্যাম্প ১ পূঃ/পঃ, ২ পূঃ/পঃ, ৩ এবং ৪ থেকে ১২ই অগাস্ট ২০১৮ থেকে ৩০শে অগাস্ট ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আশংকা ও প্রশ্নগুলি তুলে ধরার জন্য মোট ৩০১টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

১২ অগাস্ট থেকে ৩০ অগাস্ট ২০১৮

মোট মতামত		
৩০১	১৮১	১২০

ভাসানচর

> আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে নিয়ে যাবে। ভাসানচর সমুদ্রের মাঝে তৈরি হওয়া একটা নতুন দ্বীপ। সেখানে কোনও মানুষ নেই; সেখানে প্রতি বছর বন্যা হয়। মানুষ সেখানে থাকতে ভয় পায়, তাই বাংলাদেশীরা সেখানে থাকে না। ওরা [বাংলাদেশ সরকার] রোহিঙ্গাদের সেখানে থাকার জন্য নিয়ে যেতে চাইলেও আমরা ওখানে যেতে চাই না। [...] কারণ রোহিঙ্গারা বার্মা থেকে বাংলাদেশে এসেছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য; ভাসানচরে গেলে তাদের সেই প্রাণেরই ঝুঁকি হবে, তাই মানুষ খুব ভয়ে আছে।"
>
> - পুরুষ, ৪৭, ক্যাম্প ১পশ্চিম

> আমরা গুজব শুনেছি যে, বাংলাদেশ সরকার আর সেই সাথে ইউ.এন.এইচ.সি.আর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে পাঠাচ্ছে। আমরা এটা একজন মাঝির কাছ থেকে জেনেছি। এটা আমরা এক মাস আগে মাঝির কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমরা ভাসানচরে যেতে রাজী নই। কেন? আমরা শুনেছি যে, ভাসানচরে নানান ধরণের জীবজন্তু আর ডাকাতরা থাকে। [...] আমরা জেনেছি যে ভাসানচর তৈরি হয়ে বেশিদিন হয়নি; এই দ্বীপটা খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যাবে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া ওই দ্বীপটা মানুষের বসবাসের যোগ্য নয়।
>
> - পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ৪

ভাসানচরে স্থানান্তরিত করা হবে, এই নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর আশঙ্কা রয়েছে। জনগোষ্ঠীর মানুষ ভয় পাচ্ছেন যে, সেখানে কোনও সুযোগসুবিধা এবং সেবা পাওয়া যাবে না। এছাড়াও বন্যা, বন্য জীবজন্তু এবং ডাকাত নিয়েও ভয়ভীতি রয়েছে। এছাড়াও মতামতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষের এই ধারনাও প্রকাশ পেয়েছে যে, স্থানান্তরের পরিকল্পনা আসলে তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা কৌশল। তারা এটা বারবার তুলে ধরেছেন যে, তাদের প্রাণ বাঁচানোর অন্য কোনও উপায় ছিল না তাই তারা বাংলাদেশে এসেছেন। জনগোষ্ঠীর বহু মানুষই মনে করছেন যে, ভাসানচরে স্থানান্তর করা হলে তাদের জীবন আবারো বিপন্ন হবে।

শিক্ষা

> আমাদের ব্লকে মানুষ বলাবলি করে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ১৫ বছরের বড় আর ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়া শেষ করেছে, তারা নাকি এখানে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। আমরা এটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।" এদের মধ্যে কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে, মা-বাবার কথা শুনছে না। তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা এটা নিয়ে খুবই কষ্টে আছি।" আমরা তাই অনুরোধ করতে চাই যে এনজিও-রা যেন এদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল বানায় আর সরকারের [বাংলাদেশ] থেকে ভালো কিছু শিক্ষক নিয়ে চাকরিতে রাখে; এমন করলে তাদের জীবন আরও ভালো হতে পারে।। আমরা এটা [ছেলেমেয়েদের শিক্ষা] নিয়ে খুবই চিন্তিত। [এখন] ওরা আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু সেখানে তাদেরকে খেলতে ছেড়ে দেয়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে বাচ্চাদেরকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি তারা কী শিখেছে তখন তারা কিছু বলতে পারে না; শুধু গান গায়। এইজন্য আমাদের দুশ্চিন্তা হয় যেন ওদের জীবনে উন্নতি হবে না।"
>
> - পুরুষ, ২৮, ক্যাম্প ৪

> আমাদের এই এলাকায় কোনও স্কুল নেই। যেটা আছে সেটাতে বাচ্চাদের ঠিকমতো পড়াশুনা করানো হয় না। তাই আমরা বাচ্চাদের স্কুলে যেতে বললে ওরা কাঁদে আর যেতে চায় না। [...] আমাদের বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারলে আমরা ভীষণ খুশী হব।"
>
> - পুরুষ, ২৫, ক্যাম্প ১ পূর্ব

গত কয়েক মাস ধরে জনগোষ্ঠীর মতামতে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। যেখানে আগে শিক্ষা সংক্রান্ত মতামতে আরও বেশি সংখ্যক স্কুলের অনুরোধ প্রাধান্য পেত সেখানে সম্প্রতি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য স্কুলের গুনগত মান এবং তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। মানুষের মনে এমন আশংকাও রয়েছে যে, বাচ্চারা স্কুলে জুয়া খেলা শিখছে। স্কুলে ছক্কা ব্যবহার করে যে খেলা করানো হয় তার কারণে এই ধারণা তৈরি হতে পারে। তাছাড়াও, কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্কুল তৈরির অনুরোধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। জনগোষ্ঠীর মানুষ কিছু ক্ষেত্রে কিশোরকিশোরীদের জন্য শিক্ষার সীমিত সুযোগকে ক্যাম্পে সাধারণভাবে যুবাদের সুযোগের যে অভাব রয়েছে তার কারণ হিসেবে দেখছেন।

কম বয়সে বিয়ে:
এক জটিল কাহিনী, শুধু বয়সের ব্যাপার নয়...

বি.বি.সি. মিডিয়া অ্যাকশনের একটি সাম্প্রতিক গুণগত গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, যদিও জনগোষ্ঠীর মানুষ জানেন যে আইনত মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর তবু তাদের মতে এত দেরি করে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়। তাদের মতে মেয়েদের বিয়ের আদর্শ বয়স ১৩ থেকে ১৬ বছর। তাদের বিশ্বাস, মাসিক শুরুর দু' তিন বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। রোহিঙ্গারা কম বয়সে বিয়ে বলতে বোঝেন মাসিক শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ে দেওয়া।

মাসিক শুরু হওয়ার পর মেয়েরা 'জোয়ান' বা 'ডঁর' হয়েছে এমনটা বলা হয়; তারা ধরে নেয় মাসিকের শুরু হওয়ার পর মেয়েরা বিয়ের জন্য যোগ্য। কিন্তু মাসিক হওয়ার সাথে সাথে কোনও মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়ায় ঝুঁকি থাকে বলে মনে করা হয়, কারণ তাদের মতে মেয়েদের তখনও বিবাহিত নারীর জীবন যাপনের মতো পরিপক্কতা এবং জ্ঞান থাকে না। তাই পরবর্তী দুই বা তিন বছর ধরে মেয়েদের দুই ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় – একটি বাড়ির মধ্যে এবং অন্যটি ধর্মীয়। বাড়িতে শেখানো হয় কীভাবে গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে হবে, কিভাবে আদর্শ স্ত্রী হতে হবে এবং শ্বশুরবাড়ির সবাইকে কিভাবে খুশি রাখতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে থাকে নানা রকম নিয়মকানুনের পাঠ, যেমন স্ত্রীর কর্তব্য ও স্বামীর অধিকার, যৌন সম্পর্কের পরে কীভাবে স্নান করতে হবে ইত্যাদি। মানুষের মনে এই ভয় রয়েছে যে, এই সমস্ত শিক্ষা না পেলে মেয়েরা শ্বশুর-বাড়ির লোকজনের সামনে ঠিকমত আচার আচরণ করতে পারবে না এবং নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, যার কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কিংবা ভবিষ্যতে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে কম বয়সে বিয়ের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে তেমন সচেতনতা নেই।

মায়ানমারে, আইনত ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া কঠিন ছিল। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী বর ও কনে উভয়ের বয়সই যে ১৮ বছরের বেশি তার প্রমাণ দেখাতে হত এবং উকাট্টা (স্থানীয় চেয়ারম্যান) এবং স্থানীয় সরকারি অফিস গাঁটি থেকে অনুমতি নিতে হত। তবে, রোহিঙ্গারা প্রায়ই তাদের মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার পথ খুঁজে নিতেন। তারা লাউকা, অর্থাৎ স্থানীয় সরকারি দপ্তরের অফিসারকে ঘুষ দিতেন যিনি পরিবারের কার্ডে মেয়েটির

"১৬ বছর বয়স হওয়ার আগেই মেয়েকে বিয়ে দেয়া সবচেয়ে ভাল। (...) একটা মেয়ের মাসিক শুরু হওয়ার পর দুই-তিন বছরের মধ্যেই সে শিখে যায় শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কেমন করে চলতে হয় আর তার পরপরই তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিৎ।"

- পুরুষ, বয়স ২৫, ক্যাম্প ২৪, টেকনাফ

"২০ বছরের আশেপাশের বয়সে একটা মেয়ে তার রূপ হারাতে শুরু করে। তাকে দেখতে বয়স্ক লাগা শুরু হয়। (...) সমাজের মানুষ বলে, মেয়ের বয়স বেশি হয়ে গেছে আর একটা বয়স্ক মেয়ে কখনোই ভালো স্বামী পায় না। সে বয়স্ক পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। একটা মেয়ে সঠিক বয়সে বিয়ে না দেয়া হলে সমাজ মনে করে মেয়েটার সমস্যা আছে।"

- নারী, বয়স ৩৯, ক্যাম্প ৯, উখিয়া

বয়স বাড়িয়ে ১৮ বছর করে দিতেন, যাতে মেয়েটি বিয়ের যোগ্যতা লাভ করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিপজ্জনক ছিল। ৭০০,০০০ কিয়াট ($৪০০) থেকে ১,৫০০,০০০ কিয়াট ($১০০০) পর্যন্ত ঘুষ দিতে হত। কিন্তু রোহিঙ্গারা একটি মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার সুবিধার তুলনায় এই সমস্ত সমস্যা তুচ্ছ মনে করেন।

আশংকা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের ক্যাম্পে কম বয়সে বিয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে (এখানে ও এখানে দেখুন) কারণ এখানে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়া অনেক সহজ। রোহিঙ্গাদের মতে, কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর আইনি বাধা নেই এবং কোনও বাধ্যতামূলক ন্যূনতম বয়স নেই। তাদের শুধুমাত্র একটি কাগজে সই করতে হয় (সাদা কাগজ/মায়ানমারের স্ট্যাম্প পেপার/বাংলাদেশের স্ট্যাম্প পেপার) এবং কয়েকজন সাক্ষী, মৌলবি (ধর্মীয় নেতা) এবং মাঝির সামনে কিছু আচার-অনুষ্ঠান করতে হয়।

কম বয়সে, এমনকি মাসিক শুরু হওয়ার দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার আরো কিছু সুবিধা রয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রথমত, বহু রোহিঙ্গা মনে করেন যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এটা করাই সংগত- মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া যায় ততই ভালো। দ্বিতীয়ত, কনের বয়স কম হলে বরকে কম যৌতুক দিতে হয়। তৃতীয়ত, বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন যে মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার সৌন্দর্য কমতে থাকে এবং তার জন্যে বর পাওয়া আরও কঠিন হয়ে ওঠে। অনেক রোহিঙ্গা পরিবারের মনে এই ভয়ও রয়েছে যে কোনও মেয়ের কম বয়সে বিয়ে না দিলে সে পরিবারের দেখেশুনে দেওয়া বিয়ের বদলে অন্য কোনও প্রেমঘটিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারে যার ফলে পরিবারের সম্মানহানি হবে।

কম বয়সে বিয়ের যে আর্থিক সুবিধা রয়েছে ক্যাম্পের জীবনযাপনের জন্য তা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ছোট অস্থায়ী ঘরে খানিকটা জায়গা খালি হয় এবং সেই সাথে ত্রাণের খাবারে যত মানুষের পেট ভরাতে হয় সেই সংখ্যাও কমে যায়। এছাড়া মেয়েটির পরিবার মনে করে যে বিয়ে দিলে তার ভবিষ্যৎ আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করা যাবে।

মতামত দেওয়ায় রোহিঙ্গা পুরুষরা এগিয়ে থাকলেও রোহিঙ্গা নারীরা ফলাফল নিয়ে বেশি সন্তুষ্ট

সূত্র: ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের পরিচালিত একটি গুনগত গবেষণা যেটির নমুনার আকার ছিল ১৫০০ জন যাদের মধ্যে ৭৫০ জন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে সমানুপাতে পুরুষ ও নারী, উভয় উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছিল।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন — জুলাই ১৮

সম্প্রদায়			
রোহিঙ্গা	৭৫০	৩৭৫	৩৭৫
আশ্রয়দাতা	৭৫০	৩৭৫	৩৭৫

রোহিঙ্গা নারীদের তুলনায় পুরুষদের মতামত জানানোর সম্ভাবনা বেশি এবং অপেক্ষাকৃত বেশি হারে পুরুষরা ব্যক্তিগতভাবে মতামত জানিয়েছেন। কিন্তু মতামত জানানোর পরে যে ফলাফল দেখা গেছে তা নিয়ে রোহিঙ্গা নারীদের সন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যেখানে ২৭% রোহিঙ্গা পুরুষরা ব্যক্তিগতভাবে মতামত জানিয়েছেন সেখানে রোহিঙ্গা নারীদের মধ্যে তার হার ছিল মাত্র ১৫%। এর একটি কারণ হতে পারে যে, রোহিঙ্গা নারীদের অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে দেওয়া হয় না। যদিও রোহিঙ্গা নারীদের মধ্যে মতামত জানানোর হার কম ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে সন্তুষ্টির হার বেশি ছিল: মতামত দেওয়ার কারণে যেসমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ৯৮% নারীরা সন্তুষ্ট যেখানে পুরুষদের মধ্যে সন্তুষ্টির হার ৭১%। এর কারণ হতে পারে যে, তারা যে সমস্যাগুলি জানিয়েছিলেন সেগুলির প্রকৃতি ভিন্ন ছিল।

বেশিরভাগ রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে, তারা আবার মতামত জানাতে রাজী আছেন কিন্তু নারীদের এক-চতুর্থাংশ জানিয়েছেন যে, পরের বার তারা অন্য কোনও পদ্ধতিতে মতামত জানাতে চান। যেখানে ৬৫% পুরুষ এবং ৫৫% নারী বলেছেন যে, তারা এই একই পদ্ধতিতে আবার মতামত জানাবেন, সেখানে ১০% পুরুষদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) নারী জানিয়েছেন যে, তারা আবার মতামত জানাবেন কিন্তু অন্য কোনও পদ্ধতিতে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের পরিচালিত এই সংক্রান্ত গুনগত গবেষণায় এর কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীরা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সমস্যা জানাতে চান না, কারণ তারা ভয় পান যে সেগুলো লিখে রাখা হবে এবং নির্যাতনকারী সেটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিশোধ নেবে।

মতামত দেওয়ার পরে ৩৭% রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে, তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং ৩২% জানিয়েছেন যে তারা অবিলম্বে সাড়া পেয়েছেন। যাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) জানিয়েছেন যে, তারা এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়া পেয়েছেন। যারা মতামত জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ১৫% বলেছেন যে, তাদের জানানো সমস্যার সুরাহা করার জন্য এখন পর্যন্ত কিছু করা হয়নি।

চিত্র১: অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় কী ঘটেছিল?

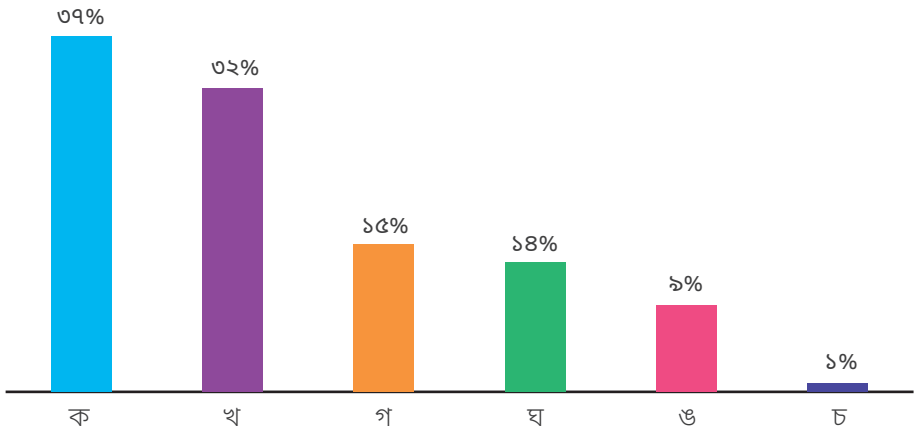

প্র. আপনি এখানে আসার পর থেকে আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কোনও মতামত বা কিছু নিয়ে কোনও অভিযোগ জানিয়েছেন? তারপরে কি ঘটেছিল?

- ক আমার সমস্যার সমাধান হয়েছিল
- খ তক্ষুনি জবাব পেয়েছিলাম
- গ এখনো কিছু হয়নি
- ঘ পরে এই বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলার জন্য অন্য কেউ আমার ঘরে এসেছিল
- ঙ আমাকে অন্য কারো সাথে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল
- চ মোবাইলে এস.এম.এস করে জবাব দেওয়া হয়েছিল

চিত্র২: অভিযোগের প্রেক্ষিতে জবাব পেতে সময় নিয়েছে

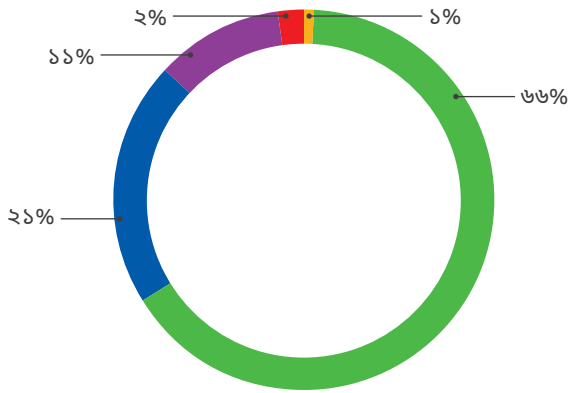

প্র. অভিযোগের প্রেক্ষিতে জবাব পেতে কত দিন সময় লেগেছিল?

- এক সপ্তাহের মধ্যে
- এক মাসের মধ্যে
- ৩০ দিনের বেশি
- কখনোই না
- প্রত্যাখ্যাত/উত্তর নেই

নমুনা: রোহিঙ্গা সম্প্রদায় (n= ৭৫০)

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।